ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম

বিপান চন্দ্র
মৃদুলা মুখার্জী. আদিত্য মুখার্জী
কে.এন. পানিক্কর. সুচেতা মহাজন

Scanned with CamScanner

১৬ বিভিন্ন কৃষক আন্দোলন ও ১৯২০-এর দশকের জাতীয়তাবাদ

প্রতিষ্ঠিত কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কৃষক অসন্তোষ ঊনবিংশ শতাব্দীতে বারবার ঘটেছে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে এই অসন্তোষের মধ্য থেকে যেসব আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল সেগুলোর একটা নতুন বৈশিষ্ট্য দেখা গেল : তখনকার জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম এসব আন্দোলনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করছে। আবার এগুলো স্বাধীনতা সংগ্রামের উপরও লক্ষণীয় প্রভাব ফেলেছে। এই সম্পর্কের জটিল চরিত্র বোঝানোর জন্যে আমরা দেশে দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কৃষক সংগ্রামের কাহিনী আলোচনা করব : উত্তরপ্রদেশের অবধে 'একা' আন্দোলন ও কিষান সভা, মালাবারে মোপালা বিদ্রোহ এবং গুজরাটে বরদোলি সত্যাগ্রহ।

★

১৮৫৬-তে ইংরেজরা অবধ দখল করার পর, ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ওই প্রদেশের কৃষিভিত্তিক সমাজের উপর তালুকদার বা বৃহৎ ভূস্বামীদের আধিপত্য বেড়েছিল। এটা এমন এক পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিয়েছিল যাতে অত্যধিক খাজনা, বেআইনি অতিরিক্ত কর, নজরানা, খেয়ালখুশিমত জমি থেকে উচ্ছেদ অধিকাংশ কৃষকদের জীবন দুর্বিসহ করে তুলেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ও তার পরে খাদ্য ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দর প্রচণ্ড বেড়ে যাওয়ায় এসব দমন-পীড়ন সহ্য করা আরো কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অবধের রায়তরা মুখিয়ে ছিলেন প্রতিরোধ করার জন্যে।

উত্তরপ্রদেশে 'হোম রুল লীগ'-এর বেশি সক্রিয় সদস্যরা আধুনিক পদ্ধতিতে রাজ্যের কৃষকদের কিষান সভায় সংগঠিত করার কাজ শুরু করলেন। গৌরীশঙ্কর মিশ্র ও ইন্দ্রনাথ দ্বিবেদীর উদ্যোগে এবং মদনমোহন মালব্যর সমর্থনে ১৯১৮-র ফেব্রুয়ারিতে গঠিত হল উত্তরপ্রদেশ কিষান সভা। এই সংগঠন যথেষ্ট সক্রিয় ছিল এবং ১৯১৯-এর জুন মাসের মধ্যে এই প্রদেশের ১৭৩টি তহশিলে অন্ততপক্ষে ৪৫০ শাখা গঠিত হয়েছিল। এই কাজের ফল ১৯১৮-র ও ১৯১৯-এর ডিসেম্বরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের দিল্লী ও অমৃতসর অধিবেশনে উত্তরপ্রদেশ থেকে যোগ দিয়েছিলেন অনেক কৃষক প্রতিনিধি।

১৯১৯-এর শেষদিকে তৃণমূল স্তরে কৃষকদের সক্রিয়তার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় প্রতাপগড় জেলায় একটা মহালে ধোপা-নাপিত বন্ধের খবরের মধ্য দিয়ে। ১৯২০-এর গ্রীষ্মকালে অবধ তালুকদারির বিভিন্ন গ্রামে গ্রাম পঞ্চায়েতর ডাকে প্রায়ই কৃষকদের সভা হত। এসবের নেতৃত্ব

Scanned with CamScanner

দিয়েছিলেন ঝিঙ্গুরি সিং ও দুর্গাপাল সিং। কিন্তু অচিরেই আবির্ভাব ঘটল আর এক নেতার। তিনি পরে বাবা রামচন্দ্র নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। তিনিই হয়ে দাঁড়ালেন আন্দোলনের মধ্যমণি।

মহারাষ্ট্রের ব্রাহ্মণ বাবা রামচন্দ্র ছিলেন একজন ভবঘুরে। তের বছর বয়সে তিনি ঘর ছাড়েন। কিছুদিনের জন্যে থিতু হয়েছিলেন ফিজিতে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে গিয়ে। শেষ পর্যন্ত ১৯০৯ সালে তিনি উত্তরপ্রদেশের ফৈজাবাদে আসেন। ১৯২০ সাল পর্যন্ত ঘুরে বেড়িয়েছেন সাধু হয়ে। তাঁর পিঠে থাকত একটা তুলসীদাসী রামায়ণ। গ্রামের শ্রোতাদের সামনে তা থেকে পাঠ করে শোনাতেন। ১৯২০-এর মাঝামাঝি নাগাদ তিনি অবধের কৃষকদের নেতা হয়ে ওঠেন। অচিরেই তাঁর নেতৃত্বদানের ও সাংগঠনিক ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া গেল।

১৯২০-এর জুন মাসে বাবা রামচন্দ্র জৌনপুর ও প্রতাপগড় জেলার কয়েকশ রায়তকে নিয়ে এলাহাবাদে যান। সেখানে তিনি গৌরীশঙ্কর মিশ্র ও জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে দেখা করে রায়তরা কি অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন তা নিজের চোখে দেখার জন্যে তাঁদেরকে গ্রামে যেতে বলেন। জওহরলাল নেহরু জুন থেকে আগস্টের মধ্যে বেশ কয়েকবার গ্রামাঞ্চলে যান এবং কিষান সভা আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করেন।

★

ইতিমধ্যে প্রতাপগড়ের ডেপুটি কমিশনার মেহতা কৃষকদের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে তাঁর কাছে যেসব অভিযোগ করা হয়েছিল সেগুলো তদন্ত করার প্রতিশ্রুতি দেন। প্রতাপগড় জেলার রুর গ্রামের কিষান সভা ছিল আন্দোলনের কেন্দ্র। প্রায় এক লক্ষ কৃষক প্রত্যেকে এক আনা করে চাঁদা দিয়ে কিষান সভার কাছে তাদের অভিযোগ নথিভুক্ত করেন। এই সময়ে গৌরীশঙ্কর মিশ্রও প্রতাপগড় জেলায় খুব সক্রিয় ছিলেন। তিনি বেদখলী ও নজরানার মত রায়তদের প্রধান প্রধান অভিযোগ সম্পর্কে মেহতার সঙ্গে মতৈক্যে পৌঁছানর জন্যে কাজ করছিলেন।

কিন্তু ১৯২০-এর আগস্টে মেহতা ছুটিতে গেলে তালুকদাররা সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ক্রমবর্ধমান কৃষক আন্দোলনের উপর আঘাত হানলেন। তারা ১৯২০-এর ২৮ আগস্ট তারিখে রামচন্দ্র ও বত্রিশ জন কৃষককে চুরির মিথ্যা অভিযোগ এনে গ্রেপ্তার করাতে সক্ষম হলেন। এতে উত্তেজিত হয়ে ৪-৫ হাজার কৃষক প্রতাপগড়ে জড়ো হলেন জেলে তাদের নেতার সঙ্গে দেখা করার জন্যে। অনেক বুঝিয়েসুঝিয়ে ফেরত পাঠানো হয় তাদের।

দশ দিন বাদে গুজব রটল বাবা রামচন্দ্রকে মুক্ত করার জন্যে গান্ধীজী আসছেন। দশ থেকে বিশ হাজার কৃষক জড়ো হলেন প্রতাপগড়ে। এবার তারা ফিরলেন আখখেতের মধ্যে একটা গাছের মাথায় বাবা রামচন্দ্র তাদের দর্শন দেওয়ার পর। কিন্তু ততক্ষণে তাদের সংখ্যা বেড়ে ষাট হাজারে দাঁড়িয়েছে। ছুটি শেষ হওয়ার আগেই মেহতাকে ডেকে পাঠানো হল পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্যে। তিনি তাড়াতাড়ি চুরির অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিলেন এবং ভুস্বামীদের উপর চাপ সৃষ্টি করলেন তাদের অপকর্ম বন্ধ করার জন্যে। এই সহজ বিজয় অবশ্য আন্দোলনকে নতুন আস্থা যোগাল। জোরদার হতে লাগল আন্দোলন।

ইতিমধ্যে কলকাতায় কংগ্রেস অসহযোগের পথ নিল এবং উত্তরপ্রদেশের অনেক জাতীয়তাবাদীই এই নতুন রাজনৈতিক পথের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতা ঘোষণা করলেন। কিন্তু মদনমোহন মালব্য সমেত এমন অনেকেও ছিলেন যারা নিয়মতান্ত্রিক পথে আন্দোলন চালানোর উপর জোর দিলেন। এই মতপার্থক্য উত্তরপ্রদেশ কিষান সভাতেও প্রতিফলিত হল। ১৯২০-এর ১৭ অক্টোবর প্রতাপগড়ে বিকল্প অবধ কিষান সভা গঠন করলেন অসহযোগের সমর্থকরা। নতুন সংগঠন বিগত কয়েক মাস ধরে অবধের বিভিন্ন জেলায় তৃণমূল স্তরে যেসব কিষান সভা গড়ে

Scanned with CamScanner

উঠেছিল সেগুলোকে নিজের পতাকাতলে নিয়ে এসেছিল মিশ্র, জওহরলাল নেহরু, মাতাবাদল পান্ডে, বাবা রামচন্দ্র, দেওনারায়ণ পান্ডে ও কেদার নাথের উদ্যোগে নতুন সংগঠন অক্টোবরের শেষে ৩৩০ টিরও বেশি কিষান সভাকে নিজের পক্ষে নিয়ে আসে। অযোধ্যা কিষান সভা বেদখলী জমি চাষ না করতে, হারি ও বেগার শ্রম (বিনা পয়সায় দুধরনের শ্রম) না দিতে, যারা এই শর্ত মানবে না তাদের বয়কট করতে এবং পঞ্চায়েতের মাধ্যমে নিজেদের বিরোধ মীমাংসা করতে কৃষকদের কাছে আহ্বান জানালেন। এই সভা প্রথম বড় ধরনের শক্তি প্রদর্শন করল ২০-২১ ডিসেম্বরে ফৈজাবাদ শহরের কাছে অযোধ্যায় সমাবেশ ডেকে। এতে প্রায় ১,০০,০০০ কৃষক যোগ দিয়েছিলেন। এই সমাবেশে বাবা রামচন্দ্র যোগ দিয়েছিলেন দড়িতে বাঁধা অবস্থায়--কৃষকদের উপর নির্যাতনের প্রতীক হিসেবে। কিষান সভা আন্দোলনের একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য উঁচু ও পিছিয়ে-পড়া উভয় জাতের কৃষকরাই এতে যোগ দিয়েছিলেন।

১৯২১-এর জানুয়ারিতে অবশ্য আন্দোলনের চরিত্রের লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটল। আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল প্রধানত রায়বেরিলি, ফৈজাবাদ ও কিছুটা পরিমাণে সুলতানপুর জেলা। আন্দোলনের ধরন ছিল বাজার, বাড়ি, শষ্যগোলা লুট ও পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ। ছোট ও বড়, কিন্তু একই ধরনের ঘটনা একের পর এক ঘটতে লাগল। এর মধ্যে কয়েকটা, যেমন রায়বেরিলি জেলায় খরিয়া বাজার ও মুন্সীগঞ্জের ঘটনা ঘটেছিল নেতাদের গ্রেপ্তারের খবর কিংবা গ্রেপ্তারের গুজব শুনে। কিষান সভার স্বীকৃত নেতারা নন, স্থানীয় লোকেরা , কিংবা সাধু সন্ত ও সম্পত্তির অধিকার হারানো মানুষেরা এর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

এসব হিংসাশ্রয়ী আন্দোলন দমন করতে সরকারকে অবশ্য বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। গুলি চালিয়ে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করা হল। গ্রেপ্তার করা হল নেতা ও কর্মীদের । তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হল। ফেব্রুয়ারি ও মার্চের দুই-একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া জানুয়ারি মাসের মধ্যেই স্তব্ধ হয়ে গেল আন্দোলন। যেসব জেলায় আন্দোলন হয়েছিল সেগুলোতে মার্চ মাসে বলবৎ করা হল 'সিডিসিয়াস মিটিংস অ্যাক্ট'। বন্ধ হয়ে গেল সমস্ত রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ। জাতীয়তাবাদীরা আদালতে রায়তদের হয়ে মামলা লড়তে লাগলেন। কিন্তু তারা তেমন সুবিধা করতে পারলেন না। ইতিমধ্যে সরকার 'অযোধ্যা খাজনা (সংশোধন) আইন' পাশ করলেন। তাতে রায়তদের তেমন সুবিধা হল না। কিন্তু এটা তাদের মধ্যে আশা জাগাতে এবং নিজের কায়দায় আন্দোলনকে দুর্বল করতে সাহায্য করেছে।

★

ওই বছরের শেষে অবধে আবার শুরু হল কৃষক আন্দোলন। তবে এবার আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল রাজ্যের উত্তরাঞ্চলে হরদৈ, বহরাইচ ও সীতাপুর জেলায়। এবার আন্দোলনটা প্রথম এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন কংগ্রেস ও খিলাফৎ নেতারা। এই আন্দোলন চালানো হয়েছিল একতা বা ঐক্য আন্দোলন নামে। কৃষকদের প্রধান অভিযোগ ছিল নির্ধারিত খাজনার চেয়ে সাধারণত পঞ্চাশ শতাংশ বেশি খাজনা আদায়ের, খাজনা আদায়ের ইজারাপ্রাপ্ত ঠিকেদারদের নিপীড়নের ও উৎপাদিত ফসলের একাংশ খাজনা হিসেবে দেওয়ার প্রথার বিরুদ্ধে।

'একা' সভাগুলো শুরু হত ধর্মীয় ক্রিয়াচারের মধ্যে দিয়ে। গঙ্গা নদীর প্রতীক হিসেবে একটা গর্ত খুঁড়ে সেটা জল দিয়ে ভর্তি করে দেওয়া হত। একজন পুরোহিতকে নিয়ে আসা হত পৌরহিত্য করার জন্যে। সমবেত কৃষকরা শপথ নিতেন : তারা শুধু নির্ধারিত খাজনা দেবেন, এবং সময় মতই দেবেন; উচ্ছেদ করা হলে জমি ছাড়বেন না; রাজি হবেন না বেগার শ্রম দিতে; অপরাধীদের সাহায্য করবেন না এবং পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্ত মেনে চলবেন।

Scanned with CamScanner

অচিরেই 'একা' আন্দোলনের নিজস্ব তৃণমূল স্তরের নেতৃত্ব গড়ে উঠল। এদের মধ্যে ছিলেন মাদারি পাসি ও অন্যান্য পিছিয়ে-পড়া জাতের নেতারা। কংগ্রেস ও খিলাফৎ নেতারা যে অহিংসার শৃঙ্খলা মেনে চলতে বলছিলেন এই নেতারা তা মানতে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন না। ফলে জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে এই আন্দোলনের যোগাযোগ ক্ষীণ হয়ে যায় এবং তা নিজের পথে চলতে শুরু করে। যাইহোক, আগেকার কিষান সভা আন্দোলন প্রায় পুরোপুরি রায়ত চাষীদের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠলেও, 'একা' আন্দোলনে অনেক ছোট জমিদারও শামিল হয়েছিলেন। সরকার এদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ ভূমি-রাজস্ব দাবি করছিলেন বলে এরাও সরকার সম্পর্কে মোহমুক্ত হয়েছিলেন। ১৯২২-এর মার্চ মাসে কর্তৃপক্ষ প্রচন্ড দমন-পীড়ন চালিয়ে 'একা' আন্দোলনের বিলুপ্তি ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

★

১৯২১-এর আগস্টে কেরালার মালাবার জেলায় শুরু হয় কৃষক বিক্ষোভ। এখানে মোপলা (মুসলমান) রায়তরা বিদ্রোহ করেন। তাদের বিক্ষোভের কারণ জমিতে ভোগ দখলের কোন নিশ্চয়তা ছিল না। পুনর্বীকরের ফী উচ্চ হারে খাজনা দিতে হত এবং ভূস্বামীরা জোর করে রায়তদের কাছ থেকে নানা কর ও নজরানা আদায় করতেন। উনবিংশ শতাব্দীতেও ভূস্বামীদের নিপীড়নের বিরুদ্ধে মোপলাদের প্রতিরোধ আন্দোলন হয়েছিল, কিন্তু ১৯২১-এর বিদ্রোহের মাত্রা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা।

এই বিদ্রোহের প্রেরণা প্রথমে এসেছিল ১৯২০-এর এপ্রিল মাসে মঞ্চেরিতে অনুষ্ঠিত মালাবার জেলা কংগ্রেস সম্মেলন থেকে। এই সম্মেলন রায়তদের দাবি সমর্থন করে জমিদার রায়ত সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের জন্যে আইন প্রণয়নের দাবি জানাল। পরিবর্তনটা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা কংগ্রেস যাতে রায়তদের দাবি সমর্থন না করে, তার জন্যে জমিদাররা প্রয়াস চালিয়েছিলেন। আগে তারা সফলও হন মঞ্জেরি সম্মেলনের পরে রায়ত কৃষকদের সমিতি গঠন করা হয়েছিল কোঝিকোড়ে। অচিরেই জেলার অন্যান্য অংশে এই সমিতি গড়ে উঠল।

একই সঙ্গে খিলাফৎ আন্দোলনেরও দ্রুত প্রসার ঘটে চলেছিল। বাস্তবিকপক্ষে, খিলাফৎ ও রায়তদের সভার মধ্যে তফাৎ করা কঠিন হয়ে পড়ত--নেতা ও শ্রোতা এক। দুই আন্দোলন পরস্পর বিজড়িত হয়ে এক আন্দোলন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই আন্দোলনের সামাজিক ভিত্তি ছিল মূলত মোপলা রায়তদের মধ্যে। বেশ কয়েকজন হিন্দু নেতা থাকা সত্ত্বেও হিন্দুরা এই আন্দোলনে যোগ দেয়নি।

খিলাফৎ-রায়ত আন্দোলনের জনপ্রিয়তা বেড়ে চলেছিল। গান্ধীজী, সওকৎ আলি ও মৌলনা আজাদের সফরের পরে এই আন্দোলন খুব অনুপ্রেরণা লাভ করে। এতে বিচলিত হয়ে সরকার ১৯২১-এর ৫ ফেব্রুয়ারি সমস্ত খিলাফৎ সভার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। ১৮-ই ফেব্রুয়ারি গ্রেপ্তার করা হয় সমস্ত বিশিষ্ট খিলাফৎ ও কৃষক নেতাকে। এদের মধ্যে ছিলেন ইয়াকুব হাসান, ইউ. গোপালা মেনন, পি. মোইদিন কয়া এবং কে. মাধবন নায়ার। ফলে নেতৃত্ব চলে যায় স্থানীয় মোপলা নেতাদের হাতে।

দমন-পীড়নে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন মোপলারা। বিশ্বযুদ্ধের ফলে ইংরেজরা দুর্বল হয়েছে , তাই তারা আর জোরদার সামরিক পদক্ষেপ নেওয়ার অবস্থায় নেই--এই গুজবে উৎসাহিত হলেন মোপলারা। তাদের মধ্যে বিদ্রোহের ও কর্তৃপক্ষকে অমান্য করার মনোভাব ক্রমশ বাড়তে লাগল। কিন্তু চরম আঘাত এল ১৯২১-এর ২০ আগস্টে। সেদিন এরানাদ তালুকের জেলাশাসক ই. এফ. টমাস পুলিশ ও সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে তিরুরঙ্গড়ির মসজিদে হানা দিলেন আলি

Scanned with CamScanner

মুসালিয়ার নামে জনৈক খিলাফৎ নেতা ও অত্যন্ত সম্মানিত মৌলবীকে গ্রেপ্তার করতে। অতি সাধারণ তিনজন খিলাফৎ স্বেচ্ছাসেবককে পেয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হল। কিন্তু খবর রটে গেল বিখ্যাত মামব্রাথ মসজিদে। মামব্রাথ মসজিদের আক্রমণ চালিয়ে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী সেটা ধ্বংস করে দিয়েছে। এই মসজিদের মৌলবী ছিলেন আলি মুসালিয়ার। কোট্টাকাল, তানুর ও পাআয়ান গাড়ির মোপলারা অবিলম্বে সমবেত হলেন তিরুরঙ্গড়িতে। তাদের নেতারা ব্রিটিশ অফিসারদের সঙ্গে দেখা করে বন্দী স্বেচ্ছাসেবকদের মুক্তি দাবি করলেন। সমবেত মানুষেরা শান্ত ও সংযত থাকলেও পুলিস নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি চালাল। নিহত হলেন অনেক মানুষ। শুরু হল সঙ্ঘর্ষ। সরকারি অফিস ভাঙ্গচুর করা হল, পুড়িয়ে দেওয়া হল নথিপত্র, লুট করা হল কোষাগার। বিদ্রোহ অচিরেই ছড়িয়ে পড়ল এরানাদ, ওয়াল্লুবনাদ ও পুন্নানি তালুকে। এসবই ছিল মোপলাদের শক্ত ঘাঁটি। বিদ্রোহের প্রথম পর্যায়ে আক্রমণের লক্ষ্য ছিল জনসাধারণের অপ্রিয় 'জেনমি' বা ভূস্বামীরা। এদের অধিকাংশই ছিল হিন্দু। আর সরকারি কর্তৃত্বের প্রতীক কাছারি (আদালত) থানা, কোষাগার, ও সরকারি দপ্তর, ও ব্রিটিশ বাগিচা মালিকরা। উদার ভূস্বামী ও দরিদ্র হিন্দুদের উপর কদাচিৎ আক্রমণ হয়েছে। বিদ্রোহীরা হিন্দু এলাকার উপর দিয়ে মহিলের পর মহিল রাস্তা অতিক্রম করার সময় শুধু ভূস্বামীদের উপর আক্রমণ করেছে, পুড়িয়ে দিয়েছে তাদের নথিপত্র। কুনহাম্মেদ হাজির মত কয়েকজন বিদ্রোহী নেতা বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেছিলেন যাতে হিন্দুদের উত্ত্যক্ত বা লুটপাট না করা হয়। যারা হিন্দুদের উপর আক্রমণ করেছিল তাদের শাস্তি পর্যন্ত দিয়েছিলেন। কুনহাম্মেদ হাজি মুসলমানদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব পর্যন্ত করেননি : সরকারের সমর্থক বেশ কয়েকজন মোপলাকে হত্যা করার বা শাস্তি দেওয়ার নির্দেশও তিনি দিয়েছিলেন।

কিন্তু ইংরেজরা সামরিক আইন জারি করে প্রচন্ড দমন-পীড়ন শুরু করার পর আন্দোলনের চরিত্রের সুনির্দিষ্ট পরিবর্তন ঘটল। অনেক হিন্দুকে হয় চাপ সৃষ্টি করে কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করতে বাধ্য করা হল, না-হয় তারা স্বেচ্ছায় সরকারকে সমর্থন করলেন। দরিদ্র অশিক্ষিত মোপলাদের মধ্যে আগে থাকতেই যে হিন্দু বিরোধী মনোভাব ছিল এটা তা আরো বাড়াতে সাহায্য করল। এমনিতেই প্রবল ধর্মীয় মতাদর্শ ছিল এদের অনুপ্রেরণার ভিত্তি। বেপরোয়া মনোভাব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে লাগল হিন্দুদের জোর করে ধর্মান্তারিত করার, তাদের উপর আক্রমণ চালানো ও হত্যা করার ঘটনা। যে আন্দোলন ছিল প্রধানত সরকার-বিরোধী ও ভূস্বামী-বিরোধী তাতে সাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রবল হয়ে উঠল।

মোপলারা হিংসাশ্রয়ী পথ নেওয়ায় অহিংসার নীতিতে বিশ্বাসী অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে তাদের সম্পর্কে ফাটল ধরল। বিদ্রোহ সাম্প্রদায়িক রূপ নেওয়ায় একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন মোপলারা। ব্রিটিশ দমন-পীড়ন থেমে থাকে নি এবং ১৯২১-এর ডিসেম্বরে স্তব্ধ হল প্রতিরোধ। ক্ষয়ক্ষতি বাস্তবিকই হয়েছিল প্রচন্ড : ২৩৩৭ জন মোপলা প্রাণ হারালেন। বেসরকারি হিসাবে সংখ্যাটা ১০,০০০। ৪৫,৪০৪ জন বিদ্রোহীকে হয় গ্রেপ্তার করা হয়, না-হয় তারা আত্মসমর্পণ করেন। বাস্তবিকপক্ষে ক্ষতি হয়েছিল আরো বেশি, তবে একেবারে অন্যভাবে। মোপলারা এমনভাবে বিধ্বস্ত ও হতোদ্দম হয়েছিলেন যে তারপর থেকে স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত কোন ধরনের রাজনৈতিক সংগ্রামে তারা অংশগ্রহণ করেননি। তারা জাতীয় আন্দোলনে কিংবা পরবর্তী বছরগুলোতে বামপন্থীদের নেতৃত্বে যে কৃষক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তাতেও যোগ দেননি।[২]

★

সুতরাং উত্তরপ্রদেশ ও মালাবারের কৃষক আন্দোলনগুলোর সঙ্গে জাতীয় স্তরের রাজনীতির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। উত্তরপ্রদেশে এই আন্দোলন অনুপ্রেরণা লাভ করেছিল 'হোম রুল লীগ'

Scanned with CamScanner

পন্থীদের কাছে থেকে, আর শেষোক্তটি অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলনের কাছ থেকে। অবধে ১৯২১-এর প্রথম কয়েক মাসে আন্দোলন যখন তুঙ্গে উঠেছিল তখন অসহযোগ সভা ও কৃষক সমাবেশের মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন হয়ে পড়ত। একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে মালাবারে সেখানে খিলাফৎ ও রায়তদের সভা মিলেমিশে একাকার হয়ে যেত। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই কৃষকরা হিংসার পথ নেওয়ায় জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে তাদের বিচ্ছেদ ঘটে এবং এই পথ থেকে সরে আসার জন্যে জাতীয়তাবাদী নেতারা কৃষকদের কাছে আবেদন জানান। জাতীয়তাবাদী নেতারা, বিশেষ করে গান্ধীজী কৃষকদের হামেশাই বলতেন জমিদারদের খাজনা বন্ধ করার মত চরম পন্থা কৃষকরা যেন না নেন।

কৃষক ও স্থানীয় নেতাদের কাজকর্ম ও ধারণার সঙ্গে জাতীয় নেতাদের মিল ছিল না। হামেশাই বলা হয়, নিজেদের 'নিরাপদ' হাত থেকে নেতৃত্ব জনগণের আরো বেশি আমূল সংস্কারকামী ও জঙ্গী নেতাদের হাতে চলে যাবে বলে মধ্যবিত্ত বা বুর্জোয়া শ্রেণী যে ভয় পেয়েছিল এটা তারই ইঙ্গিত। দাবিদাওয়া ও ব্যবহৃত পদ্ধতি উভয় ক্ষেত্রে সংযত হওয়ার আহ্বানকে দেখা হয় ভারতীয় সমাজের ভূস্বামী ও সম্পত্তিবান শ্রেণীগুলোর জন্যে উৎকণ্ঠার প্রমাণ হিসেবে। এমনও হতে পারে, সহিংস বিদ্রোহের পরিণতির হাত থেকে কৃষকদের রক্ষা করতে চেয়েছিলেন বলেই জাতীয় নেতৃত্ব এই পরামর্শ দিয়েছিলেন। আর এই পরিণতি কি হতে পারে তা বেশি দিন গোপন ছিল না--উত্তরপ্রদেশ ও মালাবার উভয় স্থানেই সরকার প্রচন্ড দমন-পীড়ন চালিয়েছিলেন এই আন্দোলন ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্যে। জমিদারদের খাজনা বন্ধ করে কৃষকরা বেশি দূর এগোতে পারবেন না বলে জাতীয় নেতারা যে পরামশ দিয়েছিলেন তার পিছনে সম্ভবত অন্য বিবেচনাবোধও কাজ করেছে। কৃষকরা খাজনা বা জমিদারি প্রথার বিলোপ ঘটানোর দাবি জানাননি। শুধু চেয়েছিলেন উচ্ছেদ, বেআইনি কর ও মাত্রাতিরিক্ত খাজনা বন্ধ হোক। জাতীয় নেতৃত্ব এসব দাবি সমর্থন করেছিলেন। খাজনা না দেওয়ার মত চরমপন্থী নিলে ছোটখাট ভূস্বামীদের পর্যন্ত আরো বেশি করে সরকারর কোলে ঠেলে দেওয়া হতে পারে এবং সরকার ও জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে যে সঙ্ঘাত চলছিল তাতে এদের নিরপেক্ষতার সামান্য সুযোগও নষ্ট হয়ে যেতে পারে বলে মনে করছিলেন তারা।

★

১৯২৮-এ গুজরাটের সুরাট জেলার বরদোলি তালুকে খাজনা বন্ধের যে আন্দোলন হয়েছিল তা নানা দিক দিয়ে ছিল অসহযোগের দিনগুলোর ফসল।[৩] বরদৌলি তালুককে ১৯২২ সালে বাছা হয়েছিল এখান থেকে গান্ধীজী আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করবেন বলে। কিন্তু চৌরিচৌরার ঘটনা সব কিছু ওলট-পালট করে দিল, ওই আন্দোলন আর শুরুই হল না। তবে ওই এলাকায় একটা লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল আইন অমান্য আন্দোলনের বিভিন্ন প্রস্তুতি কর্মের মধ্য দিয়ে। ফলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বরদোলি রাজনৈতিক শিক্ষা ও সচেতনতার এক নিবিড় প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে গিয়েছিল। দুই ভাই কল্যাণজী ও কুনবেরজী মেহতা ও দয়ালজী দেশাইর মত স্থানীয় নেতারা অসহযোগ আন্দোলনের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যে কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। এই নেতারা অসহযোগের অন্ততপক্ষে এক দশক আগে থেকেই এই জেলায় সমাজ সংস্কারক ও রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে কাজ করছিলেন। তাঁরা অনেক জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন, ছাত্রদের সরকারি স্কুল ছাড়তে রাজি করিয়েছেন, বিদেশী কাপড় ও মদ বয়কটের আন্দোলন চালিয়েছেন। দখল করেছেন সুরাট পৌরসভা।

Scanned with CamScanner

অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের পর বরদোলির কংগ্রেস কর্মীরা নিবিড় গঠনমূলক কাজকর্মে মনোনিবেশ করেন। তারা পিছিয়ে-পড়া অচ্ছুত ও আদিবাসীদের উন্নতির জন্যে কোন কাজ করেননি বলে ১৯২২-এ গান্ধীজী এদের তীব্র ভর্ৎসনা করেন।[৪] এই অচ্ছুত ও আদিবাসীদের বলা হত 'কালিপরাজ' (কালো লোক) আর উচ্চ বর্ণের লোকদের আলাদা করার জন্যে বলা হত 'উজালিপরাজ' (ফর্সা লোক)। 'কালিপরাজ'রা ছিল মোট জনসংখ্যার ৬০ শতাংশ। সমালোচনার হুলে বিদ্ধ হয়ে উচ্চবর্ণজাত এই কংগ্রেস নেতারা এই তালুকের বিভিন্ন জায়গায় ছটি আশ্রমের মাধ্যমে 'কালিপরাজ'দের মধ্যে কাজ করতে শুরু করেন। ১৯২২-এ আন্দোলন প্রত্যাহারের পর মনোবল ভেঙ্গে গিয়েছিল। তা থেকে এই তালুককে উদ্ধার করতে এসব আশ্রম অনেক সাহায্য করছে। এর মধ্যে কয়েকটি আশ্রম আজও টিকে আছে এবং উপজাতিভুক্ত মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের জন্যে কাজ করে চলেছে। কুনবেরজী মেহেতা ও কেশবজী গণেশজী উপজাতীয় ভাষা শিখে 'কালিপরাজ' গোষ্ঠীর শিক্ষিত মানুষদের সহায়তায় 'কালিপরাজ' সাহিত্যের বিকাশ ঘটান। এই ভাষায় লিখিত গদ্য ও পদ্যের সাহায্যে তাঁরা 'কালিপরাজ'দের সক্রিয় করে তোলেন 'হালি' প্রথার বিরুদ্ধে। 'হালি' ব্যবস্থায় উচ্চবর্ণজাত ভূস্বামীদের জমিতে 'কালিপরাজ'দের বংশানুক্রমে খাটতে হত। তারা মদ্যপান ছেড়ে দেওয়ার ও বিবাহের খরচ কমানর প্রতিজ্ঞা করতে পরামর্শ দিতেন। কেননা এর ফলে যে খরচ হয় তা তাদের আর্থিক দুর্দশা ডেকে আনত। এই বার্তা প্রচার করা হত 'কালিপরাজ' ও 'উজালিপরাজ' সদস্যদের নিয়ে গঠিত ভজন মণ্ডলীর সাহায্যে। 'কালিপরাজ'দের লেখাপড়া শেখানোর জন্যে নৈশ বিদ্যালয় খোলা হয় আর ১৯২৭ সালে তাদের ছেলেপুলেদের পড়ানোর জন্যে বরদোলি শহরে খোলা হয় স্কুল। আশ্রম কর্মীদের হামেশাই উচ্চবর্ণের ভূস্বামীদের বিরোধিতার মুখে পড়তে হয়েছে। কেননা তারা ভয় পেত লেখাপড়া শিখলে মজুররা 'গোল্লায়' যাবে। বার্ষিক 'কালিপরাজ' সম্মেলন হয় ১৯২২ ও ১৯২৭-এ। সম্মেলনের সভাপতি গান্ধীজী 'কালিপরাজ'দের অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান শুরু করেন। সম্মান-হানিকর 'কালিপরাজ' বা কালো মানুষ নাম বদলে তিনি নাম দেন 'রাণীপরাজ' বা বনবাসী। নরহরি পারিখ ও জুগতরাম দাভে সমেত গুজরাটের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এই অনুসন্ধান চালান। এর মাধ্যমে 'হালি' প্রথার, মহাজনদের শোষণের এবং উচ্চবর্ণের লোকেদের নারী-ধর্ষণের তীব্র সমালোচনা করা হয়। এর ফলে, কংগ্রেস 'কালিপরাজ'দের মধ্যে যথেষ্ট শক্তিশালী ঘাঁটি গড়ে তোলে এবং পরবর্তী কালেও তাদের সমর্থনের উপর ভরসা করতে পেরেছে।

আশ্রম কর্মীরা অবশ্য একই সঙ্গে সত্ত্বান কৃষকদের মধ্যে কাজ করে গেছেন এবং এদের মধ্যে নিজেদের প্রভাব কিছুটা পরিমাণে পুনরুদ্ধার করতে পেরেছেন। সুতরাং, ১৯২৬-এর জানুয়ারি মাসে যখন জানা গেল এই তালুকের ভূমি-রাজস্ব পুনর্নির্ধারণের দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী জয়াকর ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ চলতি হারের চেয়ে ত্রিশ শতাংশ বাড়ানোর সুপারিশ করেছেন, কংগ্রেস নেতারা সঙ্গে সঙ্গে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করার জন্যে স্থাপিত হল বরদোলি তদন্ত কমিটি। ১৯২৬-এর জুলাইতে প্রকাশিত এই কমিটির রিপোর্টে সিদ্ধান্ত করা হল এই খাজনা বাড়ানো অন্যায়। এরপর এর বিরুদ্ধে প্রচার চালানো হতে লাগল বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। এ ব্যাপারে নেতৃত্ব দিল গান্ধীজী সম্পাদিত 'ইয়ং ইন্ডিয়া' ও 'নবজীবন' পত্রিকা। আইনসভার সদস্যরা সমেত এই অঞ্চলের নিয়মতান্ত্রিকতায় বিশ্বাসী নেতারাও এ নিয়ে আন্দোলন শুরু করলেন। ১৯২৭-এর জুলাই মাসে সরকার খাজনা বৃদ্ধির পরিমাণ কমিয়ে ২১.৯৭ শতাংশ করলেন।

Scanned with CamScanner

কিন্তু এই ছাড় এত সামান্য, আর তা এত দেরিতে দেওয়া হয়েছিল যে কেউই এতে খুশি হয়নি। নিয়মতান্ত্রিকতায় বিশ্বাসী নেতারা এখন কৃষকদের পরামর্শ দিতে লাগলেন বাড়তি খাজনা না দিয়ে শুধু বর্তমান খাজানাটুকু দিয়ে এর বিরোধিতা করার জন্যে। অপরদিকে, 'আশ্রম' গোষ্ঠী যুক্তি দেখালেন, সরকারের উপর যদি কোন প্রভাব ফেলতে হয় তাহলে খাজনা দেওয়াই পুরোপুরি বন্ধ করতে হবে। তবে এই পর্যায়ে কৃষকরা নরমপন্থী নেতাদের কথাই বেশি শুনতে আগ্রহী বলে মনে হল।

যাইহোক, নিয়মতান্ত্রিকতায় বিশ্বাসী নেতৃত্বের সীমাবদ্ধতা যখন ক্রমশ বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠল এবং বোঝা গেল বাড়তি খাজনা না দেওয়ার ভিত্তিতে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতেও তারা রাজি নন, তখন কৃষকরা কংগ্রেস নেতৃত্বের আশ্রম গোষ্ঠীর দিকে ঝুঁকতে শুরু করলেন। শেষোক্তরা ইতিমধ্যেই বল্লভভাই প্যাটেলের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁকে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্যে রাজি করাতে চেষ্টা করছিলেন। কাদোদ ডিভিশনের বামনিতে ষাটটি গ্রামের প্রতিনিধিদের এক সভা থেকে আন্দোলনের নেতত্ব দেওয়ার জন্যে আনুষ্ঠানিকভাবে আমন্ত্রণ জানানো হল বল্লভভাইকে। স্থানীয় নেতারা গান্ধীজীর সঙ্গেও দেখা করলেন। এই ধরনের আন্দোলনের তাৎপর্য সম্পর্কে কৃষকরা যে সম্পূর্ণ সচেতন গান্ধীজীকে সে ব্যাপারে আশ্বস্ত করে তাঁর সম্মতি আদায় করলেন তারা।

প্যাটেল ৪ ফেব্রুয়ারি বরদোলিতে পৌঁছে অবিলম্বে একের পর এক সভা করলেন কৃষক প্রতিনিধিদের ও নিয়মতান্ত্রিকতায় বিশ্বাসী নেতাদের সঙ্গে। এরকম এক সভায় নরমপন্থী নেতারা শ্রোতাদের খোলাখুলি বললেন তাদের পদ্ধতি ব্যর্থ হয়েছে। এখন তারা বল্লভভাইর পদ্ধতি পরখ করবেন। কৃষকদের প্রস্তাবিত আন্দোলনের পরিণাম কি হতে পারে বল্লভভাই তাদের কাছে তা ব্যাখ্যা করে পরামর্শ দিলেন বিষয়টি নিয়ে এক সপ্তাহ ভাবার জন্যে। তারপর তিনি আমেদাবাদে ফিরে বোম্বাইর গভর্নরের কাছে চিঠি লিখে সেটেলমেন্ট রিপোর্টের ভুল হিসাবগুলো তুলে ধরলেন এবং তাঁকে অনুরোধ করলেন একটা স্বাধীন তদন্ত কমিটি নিয়োগ করার জন্যে। না হলে, তিনি কৃষকদের পরামর্শ দেবেন খাজনা বন্ধ করার ও তার ফল ভোগ করার জন্যে।

১২ ফেব্রুয়ারিতে বরদোলিতে ফিরে প্যাটেল কৃষক প্রতিনিধিদের কাছে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করলেন। সরকার যে সংক্ষিপ্ত কাঠখোট্টা জবাব দিয়েছে সেকথাও জানালেন। এরপর বরদোলি তালুকের বাসিন্দাদের সভায় প্রস্তাব গ্রহণ করে সমস্ত জমির ভোগদখলকারীদের পরামর্শ দেওয়া হল সরকার একটা স্বাধীন ট্রাইবুনাল নিয়োগ না করা কিংবা বর্তমান খাজনাকে পূর্ণ খাজনা বলে মেনে না নেওয়া পর্যন্ত তারা যেন সংশোধিত হারে খাজনা না দেন। কৃষকদের খাজনা দেবে না বলে প্রভু ও খোদার নামে শপথ নিতে বলা হল। প্রস্তাব গ্রহণের পর পাঠ করা হল পবিত্র গীতা ও কোরান। গাওয়া হল হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রতীক কবীরের ভজন। শুরু হল সত্যাগ্রহ।

এই আন্দোলন চালানোর পক্ষে বল্লভভাই প্যাটেল ছিলেন আদর্শ। খেদা সত্যাগ্রহ, নাগপুর সত্যাগ্রহ ও বরসাদ পিটুনি-কর সত্যাগ্রহের এই প্রবীণ কর্মী একমাত্র গান্ধীজীর পরেই গুজরাটের দ্বিতীয় নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। সংগঠক, সুবক্তা, অক্লান্ত প্রচারক, সাধারণ নারী-পুরুষের প্রেরণাদাতা হিসেবে তাঁর দক্ষতা আগেই জানা গিয়েছিল। কিন্তু বরদোলির নারীরাই তাঁকে সর্দার উপাধি দেন। বরদোলির অধিবাসীরা আজও স্মরণ করেন কৃষকদের মনোমত ভাষায় ঢঙে তাঁর বক্তৃতা মানুষকে কিভাবে আলোড়িত করত।

Scanned with CamScanner

সর্দার তালুকটিকে তেরটি কর্মী-শিবির বা 'ছাপানি'তে ভাগ করে প্রতিটি শিবিরের দায়িত্ব দিলেন একজন অভিজ্ঞ নেতার হাতে। গোটা প্রদেশ থেকে একশ রাজনৈতিক কর্মীকে নিয়ে আসা হল। তাদের সাহায্য করার জন্যে নিয়োগ করা হল ১৫০০ স্বেচ্ছাসেবককে। এদের অনেকেই ছিলেন ছাত্র। এদের সবাইকে নিয়ে গঠিত হল আন্দোলনের বাহিনী। স্থাপন করা হল একটা প্রকাশনা কেন্দ্র। এই কেন্দ্রই প্রকাশ করল দৈনিক বরদোলি 'সত্যাগ্রহ পত্রিকা'। এই পত্রিকায় থাকত আন্দোলনের খবর, নেতাদের বক্তৃতা, 'জাবতি' বা বাজেয়াপ্ত করার বিরুদ্ধে কি কি আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তার বিবরণ ও অন্যান্য খবর। তালুকের সুদূরতম কোণেও পত্রিকাটি বিলি করতেন স্বেচ্ছাসেবকরা। আন্দোলনের নিজস্ব গোয়েন্দা বিভাগও ছিল। আন্দোলন সম্পর্কে কোন কৃষক সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না সেটা খুঁজে বের করাই ছিল তাদের কাজ। গোয়েন্দা বিভাগের কর্মীরা দিবারাত্র ঘুরে নজর রাখতেন কৃষকরা যাতে খাজনা না দেয়। সরকার কি কি ব্যবস্থা নিতে চলেছেন, বিশেষ করে কোথায় 'জাবতি' বা বাজেয়াপ্ত করার সম্ভাবনা আছে সে সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে গ্রামবাসীদের সতর্ক করে দিতেন যাতে তারা নিজেদের বাড়িঘরে তালা লাগিয়ে পাশের বরোদাতে পালিয়ে যেতে পারেন।

কৃষকদের প্রধানত ঐক্যবদ্ধ করা হত বৈঠক, বক্তৃতা, পুস্তিকা বিলি ও বাড়ি বাড়ি গিয়ে বোঝানর মাধ্যমে। বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল নারীদের সমবেত করার উপর। এজন্যে নিয়োগ করা হয়েছিল বোম্বাইর পার্সী মহিলা মিঠুবেন পেতিত, দরবার গোপালদাসের স্ত্রী ভক্তিবা, সর্দারের কন্যা মনিবেন প্যাটেল, সারদাবেন শাহ ও সারদা মেহতা প্রমুখ নারী কর্মীদের। ফলে জনসভাগুলোতে নারীদের সংখ্যা পুরুষদের ছাড়িয়ে যেত এবং তারা দৃঢ়তার সঙ্গে সরকারের হুমকির কাছে আত্মসমর্পণ না করার শপথ নিতেন। ছাত্রদের উপরও বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হত। তাদের বলা হত পরিবারের লোকজনদের অটল থাকার জন্যে বোঝাতে।

যারা দোলাচলতার পরিচয় দিতেন তাদের পথে আনা হত সামাজিক চাপ সৃষ্টি করে ও একঘরে করে রাখার হুমকি দিয়ে। জাতপাত ব্যবস্থা ও গ্রাম পঞ্চায়েতকে এ ব্যাপারে দক্ষতার সঙ্গে কাজে লাগান হত। যারা এই আন্দোলনের বিরোধিতা করতেন তাদের ঝাড়ুদার, ধোপা, নাপিত, খেতমজুর বন্ধ হওয়ার এবং আত্মীয়-পরিজন ও প্রতিবেশীদের দিক থেকে সামাজিকভাবে একঘরে হওয়ার বিপদ থাকত। দোলাচলতা বন্ধ করার জন্যে এই হুমকিই ছিল যথেষ্ট। এই ধরনের চাপের মুখে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা হত সরকারি কর্মচারীদের। তাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করা হত না। বন্ধ করে দেওয়া হত পরিসেবা, গাড়িঘোড়া। সরকারি কাজকর্ম চালানো তাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াত। কংগ্রেস নেতারা 'কালিপরাজ'দের মধ্যে যেসব কাজকর্ম চালিয়েছিলেন তারও সুফল পাওয়া গিয়েছিল এই আন্দোলনের সময়। উচ্চবর্ণজাত কৃষকদের বিরুদ্ধে এদের লেলিয়ে দেওয়ার সরকারি চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়।

সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিয়মতান্ত্রিকতায় বিশ্বাসী ও নরমপন্থী নেতৃত্বকে এবং জনমতকে যাতে নিজেদের পক্ষে আনা যায় তার জন্যে অবিরাম চেষ্টা করেছেন সর্দার প্যাটেল ও তাঁর সহকর্মীরা। ফলে সরকার অচিরেই দেখতে পেলেন তার সমর্থক ও দরদীরা, এবং সেই সঙ্গে নিরপেক্ষরা সরকার পক্ষ ছেড়ে যাচ্ছেন। কে এম মুন্সী এবং ভারতীয় বণিক সভার প্রতিনিধি লালজী নারাণজীর মত বোম্বাই আইনসভার কয়েকজন সদস্য আইনসভার সদস্যপদ ত্যাগ করেন। এঁরা কেউই মাথা-গরম চরমপন্থী ছিলেন না। ১৯২৮-এর জুলাইতে ভাইসরয় লর্ড অরউইন স্বয়ং বোম্বাই সরকারের মনোভাব সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করতে শুরু করেন এবং আপসের পথ খুঁজে

Scanned with CamScanner

বের করার জন্যে গভর্নর উইলসনের উপর চাপ সৃষ্টি করেন। ব্রিটিশ পার্লামেন্টেও অস্বস্তিকর প্রশ্ন উঠতে শুরু করে।

দেশে জনমতও ক্রমশ অবাধ্য ও সরকার-বিরোধী হয়ে উঠত লাগল। বোম্বাই প্রেসিডেন্সির বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষকরাও নিজ নিজ এলাকার নিধারিত খাজনা সংশোধন করার জন্যে আন্দোলন করার হুমকি দিতে লাগলেন। ধর্মঘট করলেন বোম্বাইর সূতাকল শ্রমিকরা। প্যাটল ও বোম্বাইর কমিউনিস্টরা মিলে রেল ধর্মঘট করবেন এমন হুমকিও দেওয়া হল। এই ধর্মঘটের ফলে বরদোলিতে সেনা ও পণ্য সরবরাহ অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। বোম্বাই যুব লীগ ও অন্যান্য সংগঠন বোম্বাইর মানুষকে সমবেত করে এক বিশাল জনসভা ও সমাবেশের আয়োজন করলেন। পাঞ্জাব প্রস্তাব দিল বরদোলিতে পদযাত্রী জাঠা পাঠানোর। প্যাটেল গ্রেপ্তার হলে গান্ধীজী যাতে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে পারেন তার জন্যে তিনি বরদোলিতে এসে পৌঁছালেন ১৯২৮-এর ২ অক্টোবর। সব মিলিয়ে মনে হল, মুখ রক্ষার কোন ব্যবস্থা করে পিছু হটাই হবে সরকারের পক্ষে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার সবচেয়ে ভাল উপায়।

মুখ রক্ষার ব্যবস্থা করলেন সুরাট থেকে নিবাচিত আইনসভার সদস্য। তিনি গর্ভনরকে চিঠি লিখে আশ্বস্ত করলেন তদন্তের জন্যে তাঁর পূর্বশর্ত মানা হবে। পূর্বশর্ত কি চিঠিতে তা লেখা ছিল না (যদি লোকে জানত) বাড়তি খাজনা পুরোটা দেওয়া হবে না (এটাই পূর্বশর্ত)। কেননা বাড়তি খাজনা পুরোপুরি না দেওয়ার ব্যাপারে সমঝোতা আগেই হয়েছিল। গভর্নর যখন ঘোষণা করলেন আন্দোলনকারীরা 'নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ' করেছেন তখন কেউ সেকথায় গুরুত্ব দিলেন না[৫] বরদোলির কৃষকরাই জিতেছিলেন।

তদন্ত পরিচালনা করলেন ব্রুমফিল্ড নামে একজন বিচার বিভাগের অফিসার এবং ম্যাক্সওয়েল নামে একজন রাজস্ব বিভাগের অফিসার। তাঁরা রায় দিলেন, এই খাজনা বৃদ্ধি অন্যায়, এবং এই বৃদ্ধির পরিমাণ কমিয়ে ৬.০৩ শতাংশ করা হল। ১৯২৯-এর ৫মে তারিখে লণ্ডনের 'দা নিউ স্টেটসম্যান' পত্রিকা গোটা ব্যাপারটার সারসংক্ষেপ করেছিল এভাবে : 'কমিটির রিপোর্ট এমন ধমকানি দিয়েছে ভারতে কোন স্থানীয় সরকার বিগত বহু বছরে তেমন ধমক খায়নি। এর ফল সুদূরপ্রসারী হতে পারে। ...ভারতীয় ভূমি-রাজস্বের সুদীর্ঘ ও বিতর্কিত ঐতিহাসিক বিবরণীতে এর সঙ্গে তুলনীয় কোন ঘটনা খুঁজে পাওয়া কঠিন।'[৬]

স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে বরদোলি ও অন্যান্য কৃষক সংগ্রামের সম্পর্ক সবচেয়ে ভালভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে গান্ধীজীর এই বলিষ্ঠ বক্তব্যের সাহায্যে : 'বরদোলি সংগ্রাম যাই হোক না কেন, এটা স্পষ্টতই স্বরাজ অর্জনের জন্যে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ছিল না। বরদোলির মত প্রতিটি জাগরণ, প্রতিটি প্রয়াস যে স্বরাজ নিকটতর করবে এবং যেকোন প্রত্যক্ষ প্রয়াসের চেয়েও নিকটতর করবে সেকথা নিঃসন্দেহে সত্যি।'[৭]

টীকা

১। অবধে কিষান সভা ও 'একা' আন্দোলন সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন মজিদ. এইচ. সিদ্দিকি, 'অ্যাগ্রেরিয়ান আমরেস্ট ইন নর্থ ইন্ডিয়া : দা ইউনাইটেড প্রভিন্সেস (১৯১৮-২২)', নয়া দিল্লী ১৯৭৮; কপিল কুমার, 'পেজেন্টস এই রিভোল্ট : টেনান্টস, কংগ্রেস, ল্যাণ্ড লর্ড স অ্যাণ্ড দা রাজ ইন আউধ, ১৮৮৬-১৯২২', নয়া দিল্লী, ১৯৮৪, এস. গোপাল, 'জওহরলাল নেহরু : এ বায়োগ্রাফি', প্রথম খণ্ড,

Scanned with CamScanner

লণ্ডন, ১৯৭৫, পৃঃ ৪২-৫৭; রণজিৎ গুহ সম্পাদিত 'সাবলটার্ন স্টাডিজ ১'-এ জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডের প্রবন্ধ 'পেজেন্ট রিভোল্ট অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়ান ন্যাশনালইজম', দিল্লী, ১৯৮২।

২। মালাবারের মোপলা বিদ্রোহ সম্পর্কে বিশদভাবে জানার জন্যে দেখুন এ. আর. দেশাই সম্পাদিত 'পেজেন্ট স্ট্রাগল ইন ইণ্ডিয়া', নয়া দিল্লী, ১৯৭৯, পৃঃ ৬০১-৬৩০-এ কে. এন. পানিক্করের প্রবন্ধ 'পেজেন্টস রিভোল্ট ইন মালাবার ইন দা নাইনটিন্থ অ্যাণ্ড টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরিস'; ডিউই ও হপকিনস সম্পাদিত, 'দা ইম্পিরিয়াল ইমপ্যাক্ট : স্টাডিজ ইন দা ইকনমিক হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড আফ্রিকা', লণ্ডন, ১৯৭৮-এ কনরাড উডের প্রবন্ধ 'পেজেন্ট রিভোল্ট : অ্যান ইন্টার প্রিটেশন অব মোপলা ভায়োলেন্স ইন দা নাইনটিন্থ অ্যাণ্ড টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরিস'; স্টিফেন এফ. ডালে, 'ইসলামিক সোসাইটি অন দা সাউথ এশিয়ান ফ্রন্টিয়ার : দা মোপলাস অব মালাবার, ১৪৯৮-১৯২২', নিউ ইয়র্ক, ১৯৮০, সপ্তম অধ্যায়।

৩। বরদোলিতে কাজনা বন্ধ আন্দোলন সম্পর্কে দেখুন মহাদেব দেশাই, 'দা স্টোরি অব বরদোলি', আমেদাবাদ, ১৯৫৭; শিরিন মেহতা, 'দা পেজেন্ট্রি অ্যাণ্ড ন্যাশনালইজম', নয়া দিল্লী, ১৯৮৪; 'কনট্রিবিউশন টু ইণ্ডিয়ান সোসিওলজি', নতুন গ্রন্থমালা, নয়া দিল্লী, সংখ্যা ৮, ১৯৭৪, ৮৯-১০৭ পৃষ্ঠায় ঘনশ্যাম শাহ-র 'ট্রাডিশনাল সোসাইটি অ্যাণ্ড পলিটিক্যাল মোবিলাইজেশন : দা এক্সপিরিয়েন্স অব বরদোলি সত্যাগ্রহ (১৯২০-১৯২৮)' প্রবন্ধ; এবং উত্তমচাঁদ শাহ (বরদোলি, ২২ ও ২৫ জুন ১৯৮৫), চিমনলাল প্রাণলাল ভাট (বেড়চি, ২৬ জুন ১৯৮৫), কাসনভাই উকাভাই চৌধুরী (বেড়চি, ২৬ জুন ১৯৮৫), বল্লভভাই কুশলভাই প্যাটেল (সানাক্রি, ২৫ জুন ১৯৮৫), ছোটুভাই গোপালজী দেশাইর (পুনি, ২৫ জুন ১৯৮৫) সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

৪। শিরিন মেহতার 'দা পেজেন্ট্রি অ্যাণ্ড নাশনালইজম'-এর ৮৮-৮৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত কল্যাণজী ভি. মেহতার সাক্ষাৎকার।

৫। ঐ, পৃঃ ১৭৭।

৬। ঐ, পৃঃ ১৮২-৩।

৭। গান্ধী, 'কালেকটেড ওয়ার্কস' খণ্ড ৩৬, পৃঃ ৭৩।

Scanned with CamScanner